ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও তার আর্থ সামাজিক প্রভাব

সুনীলকুমার দে

প্রেক্ষাপট

ইংরেজরা যখন পূর্ব ভারতে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হচ্ছিল, তখন স্থির করলো ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভাজিত করে দিলে তাদের পক্ষে শাসন কায়েম রাখা সুবিধা হবে। লর্ড কার্জন প্রশাসনিক কাজের সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে 'বিভাজন এবং শাসন' (ডিভাইড এন্ড রুল) নীতি কায়েম করার পরিকল্পনা করলেন।[১] সেই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করার সরকারি ঘোষণা জারি করলেন। যাকে বলা হয় 'বঙ্গভঙ্গ', ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন যখন দানাবদ্ধ হচ্ছে তা দেখে ভীত হয়ে লর্ড কার্জন স্থির করলেন যে বঙ্গদেশের পূর্ব দিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তা হবে মুসলিম রাষ্ট্রে আর পশ্চিম দিক হবে হিন্দু রাষ্ট্র। যদি কার্জনের এই নীতির পরিকল্পনাকালে তারই অধীনস্ত আসামের মুখ্য কমিশনার হেনরি জন স্ট্যাডম্যান কটন তার কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড কার্জন ও তার মুখ্য সচিব মিলে সরকারিভাবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন।[২]

এই বিভাগ অনুযায়ী বঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ দুটি প্রদেশে ভাগ হলো ঃ (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও অধিকাংশ বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যা সমৃদ্ধ পাটনা ভাগলপুর, বর্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি নিয়ে গঠিত হলো 'বঙ্গপ্রদেশ', যার মুখ্য কার্যালয় ছিল কলকাতা, (২) পূর্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা সমৃদ্ধ এলাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা, কুমিল্লা, আসাম, সিলেট, এবং ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত হলো "পূর্ববঙ্গ এবং আসাম" প্রদেশ, যার মুখ্য কার্যালয় হল ঢাকা। পরবর্তীকালে এই বিভাজনকে ভাষা এবং জাতির ভিত্তিতে আবার পুনর্বিন্যস্ত করা হল। হিন্দিভাষী ছোটনাগপুর চলে এলো কেন্দ্রীয় প্রদেশে, আর ওড়িশা ও সম্বলপুর যুক্ত হলো বঙ্গপ্রদেশ এর সঙ্গে।

ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গদেশের এই বিভাজন জনগণের মধ্যে প্রবল ক্রোধের সঞ্চার করে এবং ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের অংশ থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শুরু করলো স্বদেশী আন্দোলন। ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন করা, বিভিন্ন সভা ও মিছিল সংগঠিত করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রদানের মাধ্যমে চলতে থাকে এই আন্দোলন।[৩] পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার জনগণ মনে করলো যে এই বিভাজনের মাধ্যমে শিক্ষা এবং চাকুরীক্ষেত্রে তাদের অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যার জন্য তারা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠন করে মুসলিম লীগ নামক সংগঠন।[৪] ক্রমাগত এই রাজনৈতিক আন্দোলন ও কূটনৈতিক চাপের বশবর্তী হয়ে তদানীন্তন ইংরেজ শাসক লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাভাষীদের

অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় দুই বঙ্গকে একত্রিত করে দেন। এর মাধ্যমে আবার নুতন প্রশাসনিক বিভাগ তৈরী হলো ঃ পশ্চিমে বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ, পূর্বে অসম প্রদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গ প্রদেশ। এই পুনর্বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানীও কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলো। নবগঠিত এই বঙ্গপ্রদেশের মোট আয়তন ছিল ৪৯০,০০০ বর্গ কিমি (১৮৯,০০০ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ছিল ৭৮.৫ মিলিয়ন।

ভারতের স্বাধীনতা ও পুনর্বিভাজন

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভাজনের অঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয়বারের জন্য আবার ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গদেশ বিভাজিত হলো। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হলো দুটো ভিন্ন রাষ্ট্রের—ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করে দিলেন তদানীন্তন আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ণায়ক সংস্থার চেয়ারম্যান স্যার সাইরিল রেডক্লিফ, যদিও তিনি তার জীবদ্দশাতে কখনো ভারতে আসেননি।[৫] তার নামানুসারে এই সীমানার নাম দেওয়া হলো রেডক্লিফ রেখা।[৬] বঙ্গপ্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটা আলাদা দেশ হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান নাম (যা পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা চালিত হতো), আর একটি চলে এলো স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে, যার নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ। সমভাষা, সমখাদ্যাভ্যাস, সমসংস্কৃতি, সমপোশাক পরিচ্ছদ সম্পন্ন একই বঙ্গপ্রদেশে মা হয়ে গেলেন দ্বিখণ্ডিত। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়া দুই বঙ্গের মতের অমিল শুরু হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা টিকিয়ে রাখার আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা থেকেই এই আন্দোলনের শুরু। ১৯৪৮ স্যাবের ১১ মার্চ সকল বাংলাভাষী জনগণ রাস্তায় নেমে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন যাদের মধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার হন এবং অনেকে মৃত্যুবরণও করেন। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও কিছু করার নেই, কারণ পূর্ব পাকিস্তান তখন আলাদা দেশ হয়ে গেছে। এই আন্দোলন স্তিমিত করতে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলী জিন্না ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় পদার্পন করেন এবং ২১ মার্চ উর্দু ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল খাওয়াজা নিজামুদ্জিন ও তার পূর্বসূরির রাস্তাতেই চললেন।[৭] তার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে গেল বাংলা ভাষা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। লাগাতার প্রতিবাদ, সভা, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।[৮] প্রতিদানে চলে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিরীহ ছাত্রেরপ্রাণ। ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জমায়েত হলো প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এভং শুরু হলো বৃহত্তর আন্দোলন। এই আন্দোলন চলার প্রায় দুই বছর পর ১৯৫৪ সালের ৭ মে পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভা বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করলেন এবং ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধানেও এই ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ভাষা আন্দোলনের শুরুর এই দিনটিকে তাই 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে।[৯]

এই আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মতবিরোধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ তৎকালীন সামরিক শাসক আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি চাপিয়ে দেওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকেও বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত করে চলেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও ভাষা আন্দোলনের ও ভাষা আন্দোলন ও জয়লাভ করার পর উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু করেন দেশের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' করার জন্য। এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে। এরই মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের দল 'আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। তারপরও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। ওই বছরই ৩রা ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সামিল হলে পশ্চিম পাকিস্তান ১৬ ডিসেম্বর তারিখে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয় এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের পুনরায় উন্নতি হতে শুরু করে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমানা পুনর্বিন্যাস

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে ভারত বাংলাদেশ সীমানা নির্ধারিত হলেও তা কেবলমাত্র সীমান্ত প্রহরীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সীমান্ত চেক পোস্ট বলে সরকারিভাবে তেমন কিছু চালু হয় নি বা অভিবাসন দপ্তরও তখন ছিল না। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হবার পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং সীমানা ও সীমান্ত চেকপোস্ট নিয়েও একের পর এক আলাপচারিতা চলতে থাকে। ততদিন পর্যন্ত রেডক্লিফের নির্ধারিত সীমানাই অনুসরণ করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই নির্ধারিত সীমানাতে বিভিন্ন রকম বিতর্ক দেখা যেতে থাকে। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'ছিটমহল'। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তীকালে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন 'ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ ট্রাইবুনাল' গঠন করেন। যদিও সেই ট্রাইবুনালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু তার মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার সমাধান তো হয়ই নি, বরং সীমারেখার বিভিন্ন প্রান্তে খুনোখুনি চলতে থাকে।

এই ছিটমহল বাস্তবে কি? ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর প্রচুর টুকরো ভূমিভাগ যেগুলিকে একত্রিত অবস্থায় ছিটমহল বলা হয়। মোগল আমলে কোচবিহার রাজ্যের দক্ষিণে রংপুরের কিছু এলাকা আকবরের সেনাপতি মানসিংহ দখল করে রেখেছিলো। এই রংপুরের রাজাদের সাথে কোচবিহার রাজাদের ঝগড়া-বিবাদ থেকে তিস্তার উভয় পাড়ে ছোট ছোট জমি বাজি রেখে তাস ও দাবার লড়াই চলতো। বিজয়ী রাজা ওই এলাকার দখল নিতো। এভাবেই ছিটকে যাওয়া এলাকাগুলিকেই ছিট বা ছিটমহল বলা হয়ে থাকে।[১০] এই ছিটমহলের অধিকাংশ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুরের অধীনস্থ ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের ফলে কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলা ভারতের অর্ন্তভুক্ত হয় এবং রংপুর চলে যায় পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমানের বাংলাদেশে। এই সমস্ত ছিটমহলের মধ্যে ভারতের ১১১ টি ছিটমহল বাংলাদেশের মধ্যে (প্রায় ১৭১৬১ একর) এবং বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের মধ্যে (৭১১০

একর) অবস্থিত ছিল। যদিও এ নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। সীমান্তের এই ছিটমহল সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় আলোচনায় বসেন এবং এইসকল ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সীমানা সহজতর করার জন্য "ভূমি সীমানা চুক্তি" স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এই চুক্তি অনুমোদন করলেও ভারত তার অনুসমর্থন দিতে ব্যর্থ হলো।[১১] ২০১১ সালে এই ছিটমহলের সমাধানকল্পে পুনরায় দুই দেশ রাজি হয় এবং অবশেষে ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতীয় সংবিধানের ১৯৯ তম সংশোধনীতে তা গৃহীত হয়। উভয়দেশের গৃহীত এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ভারতকে ২,৭৭৭.০৩৮ একর ও ভারত বাংলাদেশকে ২, ২৬৭.৬৮২ একর জমি বিনিময় করে সীমান্ত সংক্রান্ত এই সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করে দেন।[১২] এই চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহলের অন্তর্গত বাসিন্দারা নিজেদের স্থানেই থাকতে পারে অথবা নিজেদের পছন্দমতো দেশেও স্থানান্তরিত হতে পারে। ভারত ও বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক সীমানা সরলীকরণের পর এই সীমানার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৪,০৯৬ কিমি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই সীমানার দৈর্ঘ্য ২,২১৬ কিমি, আসামের সঙ্গে ২৬৩ কিমি, মেঘালয়ের সঙ্গে ৪৪৩ কিমি, ত্রিপুরার সঙ্গে ৮৫৬ কিমি এবং মিজোরাম—এর সঙ্গে ৩১৮ কিমি।[১৩]

কলকাতা ও যশোর যেহেতু আগে থেকেই যশোর রোডের দ্বারা সংযুক্ত ছিল, তাই পেট্রোপোল-বেনাপোল—এই সর্বপ্রথম কাস্টমস চেকপোস্ট হয় ১৯৭২ সালে। তারপর একের পর এক সীমানা চেকপোস্ট চালু হতে থাকে। ব্যবহার এর নিরিখে চেকপোস্টগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।[১৪]

(১) সমন্বিত চেকপোস্ট

যে সমস্ত সীমান্ত চেকপোস্ট একই ছাদের নিচে বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক পরিষেবা প্রদান ছাড়াও পণ্যসম্ভার প্রক্রিয়া ভবন, পণ্যসম্ভার পরিদর্শন ভবন, গুদাম ঘর, হিমঘর, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা, ইন্টারনেট পরিষেবা, ক্লিয়ারিং এজেন্ট, ব্যাঙ্ক পরিষেবা, গাড়ি স্ক্যান ব্যবস্থা, অভিবাসন ব্যবস্থা, পার্কিং ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত তাদেরকে সমন্বিত চেকপোস্ট বলে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এরকম সমন্বিত চেকপোস্টগুলো নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা-ঢাকা (ভায়া পেট্রোপোল)

মেখলিগঞ্জ-বুড়িমারী (ভায়া চ্যাংড়াবান্ধা)

এছাড়া ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত চেকপোস্টগুলি সমন্বিত চেকপোস্টে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেকগুলির ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপিত হয়ে গেছে। যেমনঃ

হিলি-হাকিমপুর (হিলি চেকপোস্ট — উত্তর দিনাজপুর)

ভোমরা - ঘোজাডাঙ্গা (ঘোজাডাঙ্গা চেকপোস্ট - উত্তর চব্বিশ পরগণা)

মালদহ-রাজশাহী (মহাদিপুর চেকপোস্ট - মালদহ)

ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা (বিন্নাগুড়ি চেকপোস্ট - জলপাইগুড়ি)

(খ) আসাম

করিমগঞ্জ - গোপালগঞ্জ (সুতারকান্দি চেকপোস্ট - করিমগঞ্জ)

(গ) মেঘালয়

শিলঙ-সিলেট (ডাউকি চেকপোস্ট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে)

(ঘ) মিজোরাম

কাত্তারপুছিয়া - ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

(ঙ) ত্রিপুরা

আগরতলা - আখাউড়া (আখাউড়া চেকপোস্ট-আগরতলা)

শান্তিরবাজার - ফেনী (শান্তিরবাজার চেকপোস্ট - দক্ষিণ ত্রিপুরা)

(২) ভূমি কাস্টমস্ স্টেশন [Land Customs Station]

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন (এল সি এস) বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণরত পণ্য ও যাত্রীদের জন্য ট্রানজিট, কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন এবং কার্গো হ্যান্ডলিং পরিষেবা সরবরাহ করার একটি বড় সুবিধা। পোর্টাল' ধারণাটিতে প্রস্তাবিত এলসিএস কেন্দ্রগুলির কেন্দ্রীয় স্থাপত্য ধারণা। এলসিএস ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ বা বেরিয়ে যাবার জন্য উপযুক্ত প্রবেশপথ। কিন্তু সমন্বিত চেকপোস্টগুলির মতো সুযোগ সুবিধা এই সকল চেকপোস্ট বা স্টেশন এ পাওয়া যায় না। ভারত-বাংলাদেশ এর সীমানা বরাবর এই ধরণের এলসিএস গুলি হলো ঃ

(১) আসাম

মানকাছার (ভারত) - রাউমারি পোস্ট (রংপুর, বাংলাদেশ)

করিমগঞ্জ ফেরি স্টেশন (ভারত) - জকিগঞ্জ পোস্ট (সিলেট, বাংলাদেশ)

ধুবড়ি স্টীমার ঘাট (ভারত) - রাউমাটি (ময়মনসিং, বাংলাদেশ)

এছাড়া অ-কার্যকরী স্টেশনগুলি হলো— .

মাহিশাসন রেল স্টেশন (করিমগঞ্জ, ভারত) শাহাবাজপুর (সিলেট, বাংলাদেশ)

গোলোকগঞ্জ (ধুবড়ি, ভারত)—সোনাহাট (রংপুর, বাংলাদেশ)

শিলচর মালগাড়ি পরিষেবা (অসম, ভারত) কোনো সীমানা বা পোস্ট নেই।

(২) মেঘালয়

বাগমারা (দক্ষিণ গারো পাহাড়, ভারত) - বিজয়উর পোস্ট (বাংলাদেশ)

ভোলাগঞ্জ (পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত) - ছাতক (সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)

বড়শারা এলসিএস (পশ্চিম খাসি পাহাড়, ভারত) - বড়শারা পোস্ট (বাংলাদেশ)

বকশীগঞ্জ (পশ্চিম গারো পাহাড়, ভারত) - মাহেন্দ্রগঞ্জ (বাংলাদেশ)

তুরা-নালিতাবাড়ী ভায়া ডালু (পশ্চিম গারো পাহাড়, ভারত) - নাকুগাঁও পোস্ট (বাংলাদেশ)

শেলাবাজার (পশ্চিম খাসি পাহাড়, ভারত) - সুনামগঞ্জ (সিলেট বাংলাদেশ)

গাসুয়াপাড়া (দক্ষিণ গারো পাহাড়, ভারত) - করৈতল (ময়মনসিং, বাংলাদেশ)

অ-কার্যকরী স্টেশনগুলি হলো—

রিঙ্কু (পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত) - কালীবাড়ি (সোনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)

বালাট (পূর্ব খাসি পাহাড়, ভারত) - ডলুরা (সিলেট, বাংলাদেশ)

(৩) ত্রিপুরা

শ্রীমন্তপুর (সিপাইজলা, ভারত) - বিবির বাজার (কুমিল্লা, বাংলাদেশ)

ধোলাইঘাট (ধলাই, ভারত) - কুমারঘাট (সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)

খোয়াইঘাট (পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত) - বল্ল (হাবিবগঞ্জ, বাংলাদেশ)

মনু ((ধোলাই, ভারত) - চাতালপুর (সিলেট, বাংলাদেশ)

মুহুরীঘাট (দক্ষিণ ত্রিপুরা, ভারত) - বিলোনিয়া (ফেনী, বাংলাদেশ)

পুরোনো রাগনাবাজার (উত্তর ত্রিপুরা, ভারত) - বেতুল (ফুলতলী, বাংলাদেশ)

(৪) মিজোরাম

অ-কার্যকরী স্টেশন -

দেমাগিরি (লুংলেই, ভারত) - রাঙামাটি (সিলেট, বাংলাদেশ)

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এলসিএস গুলিই সমন্বিত চেকপোস্ট এ উন্নীত হয়ে গেছে, তাই এই রাজ্যে আর কোনো এলসিএস নেই।

উপরিবর্ণিত সমস্ত চেকপোস্টই সড়ক এবং স্টীমার দ্বারা যুক্ত। কিন্তু সরাসরি ভারত থেকে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার কোনো মাধ্যম ছিল না। বঙ্গ বিভাজনের পর একদিকে যেমন আত্মীয় স্বজন দুই দেশের মধ্যে বিভাজিত হয়ে গেলো, অপরদিকে তেমনি একই ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়েও কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে একটি সীমারেখা নির্ধারিত হলো। ক্রমে ক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগের প্রয়োজন আরো বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য দুই দেশের সরকার একত্রে বসে সরাসরি ভারত-বাংলাদেশ বাস যোগাযোগ চালু করার কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের ১৯ জুন চালু হলো কলকাতা-ঢাকা সরাসরি বাস পরিষেবা। সপ্তাহে তিনদিন ঢাকা থেকে এবং তিনদিন কলকাতা থেকে এই বাস চলতে থাকে। প্রথমে কেবলমাত্র সরকারি বাস চললেও পরবর্তীকালে প্রাইভেট বাস সার্ভিসও চালু হয়। বর্তমানে রবিবার বাদে সপ্তাহে প্রতিদিন এই বাস চালায় সোহাগ, গ্রীন লাইন এবং শ্যামলী পরিবহন সংস্থা।

সড়ক পথ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গেদে ও বাংলাদেশের দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং পেট্রোপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বন্ধন এক্সপ্রেসের মাধ্যমে রেল পথেও যাতায়াত করা যায়। এই রেল পথ দিয়ে আন্তর্জাতিক মালগাড়িও যাতায়াত করে।

আন্তর্জাতিক সীমানার আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ভারত বিভাজনের পর একদিকে যেমন খাদ্যশস্য ও পাট উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেল, অন্যদিকে তেমনি শিল্পক্ষেত্রগুলো ভারতের মধ্যে রয়ে গেল। ফলে প্রাথমিকভাবে উভয় দেশই অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটে। আন্তর্জাতিক সীমানা তৈরির মাধ্যমে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিও পরিবর্তিত হলো।

অর্থনৈতিক প্রভাব

(১) ভ্রমণ শিল্প—বঙ্গ বিভাজনের পর কেবলমাত্র পিলার বা স্তম্ভ দিয়ে সীমানা

নির্ধারিত হলেও পরবর্তীকালে তা তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়, যদিও তা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক সীমানা তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণকারীরা তার অনুভূতি আস্বাদন কল্পে ছুটে আসে। ফলে উভয় দেশের ক্ষেত্রেই সীমানা দর্শনের মাধ্যমে ভ্রমণ শিল্পের বিস্তার লাভ ঘটতে থাকে। কেবলমাত্র চেকপোস্টই নয়, সীমানার যে কোনো অংশেই দর্শনার্থীদের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য — আন্তর্জাতিক সীমানা চেকপোস্ট নির্মাণের পর ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটে। এর ফলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রারও আদান প্রদান হয়। ভারত থেকে বাংলাদেশে যেমন সুতিবস্ত্র, পশম, লৌহ-ইস্পাত সামগ্রী, ট্রাক, মোটরবাইক, ট্রাক্টর, ওষুধ, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চিনি প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়, তেমনিই বাংলাদেশ থেকে ভারত পাটজাত দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, রেশম, মাছ, জৈব রবার প্রভৃতি আমদানি করে। ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যের আরো প্রসার ঘটে চলেছে।

(৩) কর্মসংস্থান—আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য উভয় দেশের সীমান্ত চেকপোস্টগুলিতে গুদামঘর, হিমঘর প্রভৃতি থাকা আবশ্যিক। কোনো দেশ থেকে সরকারিভাবে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদি সীমানা পার করে অপর দেশের গুদামঘরে খালি করে আসতে হয়। তার জন্য গুদামঘর ম্যানেজার, কর্মচারী, কালারিং এজেন্ট এবং প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

(৪) সীমান্ত হাট — ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশ, মায়ানমার, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ফলে ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ওই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে আন্তঃ-নির্ভরতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গত দশকের মধ্যে কুটনৈতিক ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরী হওয়ায় এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতি সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাস্তব সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিবেচনা করে ১৯৯১ সালে Look East Policy ঘোষণা করেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চক্রকেন্দ্র এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশপথ হিসেবে গড়ে তোলা। এই কথা মাথায় রেখে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উভয় দিকে দূরবর্তী গ্রামসমূহের উৎপাদিত দ্রব্যের আদান-প্রদান কল্পে সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চলে গড়ে তোলা হয় সীমান্তবর্তী হাট। এর মাধ্যমে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং বাণিজ্যিক মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠবে এই আশা নিয়ে সীমান্তবর্তী হাটকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই হাটের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কালোবাজারি কাজকর্ম ও বাণিজ্য বন্ধ হবে বলেও আশা করা হয়। মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার অনেকাংশেই এরকম কিছু হাট চালু হয়ে গেছে এবং কিছু হাটের পরিকল্পনাও অনুমোদন হয়ে গেছে। নিচে এদের একটা তালিকা দেওয়া হলো ঃ

(১) মেঘালয়-কলাইচর (পশ্চিম গারো পাহাড়); বালাট (পশ্চিম খাসি পাহাড়)

(২) মিজোরাম-মারপাড়া (মামিত); সিলসুরি (লুঙ্গেই); তুইপাইবাড়ি (মামিত); নুনসুরি (লুঙ্গেই)

(৩) ত্রিপুরা - কমলাসাগর (পশ্চিমত্রিপুরা); বক্সনগর (পশ্চিম ত্রিপুরা); বামুটিয়া (পশ্চিম ত্রিপুরা); শ্রীনগর (দক্ষিণ ত্রিপুরা); একিমপুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা); পাল বস্তি (উত্তর ত্রিপুরা); হিরাছড়া (কৈলাশহর) কমলপুর (ধলাই)

সামাজিক প্রভাব

সাংস্কৃতিক প্রভাব—বিভাজন পূর্ববর্তী সময়ে ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত সামঞ্জস্য থাকলেও বিভাজনের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে জনগণের মধ্যে সংস্কৃতিক দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতের অধিবাসীদের 'বাঙাল' ও 'ঘটি' নামকরণ করা হয়। এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির অমিল খুঁজে বের করার প্রবণতা বাড়তে থাকে, যা আজও বিদ্যমান।

নাগরিকত্বের উপর প্রভাব

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন ধরণের ভূ-প্রকৃতি ও নদী নালা বিদ্যমান। পূর্ব ও উত্তর দিকে যেমন পাহাড়, মালভূমি বিদ্যমান, তেমনই পশ্চিমদিকের সীমানা বরাবর নদী ও নদীগঠিত প্লাবনভূমি বিদ্যমান। বড় বড় নদী উপত্যকার মাঝখান বরাবর অনেকাংশেই এই সীমানা চলে গেছে। নিম্নগতিতে নদীর স্বাভাবিক ধর্মই হলো আঁকাবাঁকাভাবে প্রবাহিত হওয়া অথবা নদীর গতির পরিবর্তন করা। নদীর এই গতি পরিবর্তিত হলে নদীর অবতল দিকে বসবাসকারী অধিবাসীদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অধিবাসীদের কাছে এটা একটা জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা।

সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা ও বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা বরাবর ইচ্ছামতী নদী বয়ে চলেছে। প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর দিনে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন উপলক্ষ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারিতে এই ইচ্ছামতী নদীতে উভয় দেশেরই প্রতিমা বিসর্জন উৎসব পালিত হয়। উভয় দেশেরই নাগরিকগণ এই ভাসান উৎসব উপভোগ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা আবার ভিন্ন দেশের নাগরিক, আবার সেই বিভাজন, আবার প্রশাসনিক দূরত্ব।

দারিদ্র্য সৃষ্টি—দেশ বিভাজনের পর প্রচুর সংখ্যক নাগরিক সীমানার অপর প্রান্তে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারলেও বেশির ভাগ নাগরিক সীমান্ত পেরোবার সময় নিজেদের সঞ্চিত সমস্ত কিছু খুইয়ে অপর দেশে চলে আসেন। এর ফলে বেশ কিছুদিন ধরে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তারা জীবনধারণ করতে থাকেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হত্যা—একই মাটির অন্তর্গত হয়েও দুটি ভিন্ন দেশ হয়ে যাবার ফলে জনগণের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক দেশের সীমান্তরক্ষী অপর দেশের সীমান্তরক্ষীদের শত্রুর চোখে দেখতে শুরু করলো। যার জন্য মাঝে মধ্যেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গোলগুলি বর্ষণ হতে থাকে এবং সেনাবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষের অনেকেই প্রাণ হারান।

এছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যা, অনৈতিক অভিবাসন বা অনুশাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম।[১৫]

সূত্র নির্দেশিকা

১. "Indian History : Partition of Bengal". Encyclopaedia Britannica, 4 February 2009.

২. Chandra Bipan, History of Modern India, ISBN 978-81-250-3684-5, pp. 248-249.

৩. Johnson, Gordon (May 1973). "Partition, Agitation and Congress : Bengal 1904 To 1908". Modern Asian Studies. 7 (3) : 533-588. JSTOR 311853.

৪. "The heritage of Bangla Patriotic songs". The Daily Star, 15 August 2012.

৫. Read, Anthony : Fisher, David (1998). The Proudest Day : India's Long Road to Independence, New York : W.W. Norton & Company. p. 482. ISBN 9780393045949

৬. Bala, Ashok (2016), India-Bangladesh border killing. South Asia Journal, Blog 3 December, 2017.

৭. Glassic, Henry and Mahmud, Feroz (2008). Living Traditions. Cultural Survey of Bangladesh Series-II, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. International Mother Language Day.

৮. Al Helal, Bashir (2012). "Language Movement". In Islam, Sirajul Jamal, Ahmed A Banglapedia : National Encyclepedia of Bengladesh (Second ed.) Asiatic Society of Bangladesh.

৯. Oldenburg, Philip (August 1985). "A Place Insufficiently Imagined" : Language. Belief and the Pakistan Crisis of 1971". The Journal of Asian Studies. Association for Asian Studies. 44 (4) 711-733.

১০. পুরকায়েত, সনৎকুমার (২০১৬), সীমান্ত পুনর্গঠন ও ছিটমহল সমস্যাবহুল বাংলার ভূ-রাজনীতি। ভূগোল ও পরিবেশ, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৬, ১৪-১৯।

১১. Sougata Mukhopadhyay (7 September 2011). "India-Bangladesh sign pact on border demarcation". CNN-IBN Retrieved 20 September 2011."

১২. The Constitution (119th Amendment) Bill, 2013 PRS India. Accessed 10 May 2015 [2]

১৩. "India-Bengladesh News from India". India Monitor. 11 July 2007. http://www.mdoner.gov.in/node/1483 ICP of India

১৪. Indian Express, 18 October, 2017.

১৫. ভট্টাচার্য্য, পবিত্র (২০১৬) ভারত বিভাজনের প্রভাব। ভূগোল ও পরিবেশ, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১৬, ২৪-২৫।